The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXX, pp 339-354, ISSN 2306-3920

‘রবীন্দ্রদর্শনে পরমসত্তার স্বরূপ : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা’

মোঃ এলাম উদ্দীন*

[**সার-সংক্ষেপ :** এ প্রবন্ধে “রবীন্দ্র দর্শনে পরমসত্তার স্বরূপ” সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। অবশ্য “পরমসত্তার স্বরূপ” নির্ণয়ে রবীন্দ্র চেতনার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল ও তাঁর অনুগামী ইংরেজ দার্শনিক ব্রাডলীর “পরমসত্তার স্বরূপ” সম্পর্কে সাদৃশ্য থাকলেও পার্থক্যও প্রকট। রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে ভাববাদী। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের ব্রাডলীর মতো তাঁর পরমসত্তাকে অগম্য ও অচিন্তনীয় মনে করেননি। আবার হেগেলের মতো বিশুদ্ধ চিন্তার রীতিকেও তিনি বিশ্বব্যাখ্যার সর্বোত্তম উপায়রূপে গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হৃদয়ের উন্মীলনের মাধ্যমে পরমসত্তার অভিজ্ঞতা সম্ভব। জ্ঞান থেকে নয়, দৃষ্টি আর বোধ থেকেই সেই অভিজ্ঞতার স্পর্শ পাওয়া সম্ভব নয়। ঐক্যের সামগ্রিক রূপই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বাধিক। “রবীন্দ্র দর্শনে পরমসত্তার স্বরূপ” সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা “পরমসত্তার স্বরূপ” সম্পর্কে এ প্রবন্ধে প্রথম বিচারের অন্বিষ্ট। এ সমীকরণের নিরিখেই আলোচ্য প্রবন্ধে “রবীন্দ্র দর্শনে পরমসত্তার স্বরূপ” সম্পর্কীত আলোচনা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখানো হবে।]

বাস্তব জগতে বিরোধমুক্তি ও বিরোধযুক্তির সমস্যা চিরন্তন। জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মানুষের ঐতিহাসিক ও সার্বজনীন আত্মিক অবস্থা, সসীমতা ও অসীমতার ধারণা, দার্শনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার বিভিন্ন নিশ্চয়তাগুলোর সঙ্গে মানুষের পরিচয় ব্যক্তিগত সত্তার অনুভূতির সঙ্গে জড়িত। এসব সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সসীমতার রূপটি জটিলতর হয়েছে এবং বিরোধকে অতিক্রম করার আদর্শ হিসেবে বিরোধমুক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে নানাভাবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রদর্শনে এসব সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রাচ্য বা

---

* ড. **মোঃ এলাম উদ্দীন :** সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রতীচ্যের কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদকে আশ্রয় করেননি কিংবা দার্শনিকদের মতো তিনি তাঁর জগত ও জীবন সম্পর্কীয় নিজস্ব চেতনাপ্রবাহকে সুসংহত যুক্তিমাধ্যমে দার্শনিকতত্ত্বে রূপায়িত করেননি একথা সত্য এবং তিনি স্বয়ং নিজেকে দার্শনিক আখ্যায় ভূষিত করতে তাঁর সবিনয় আপত্তিও জানিয়েছিলেন। তথাপি বিশ্বরহস্যের কেন্দ্রে তাঁর ভাবনার আভিমুখ্য, পরমসত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে তাঁর আমৃত্যু সৃষ্টিশীল মনের ব্যাকুলতা একটি দার্শনিক ভঙ্গীকে অনিবার্যভাবে সূচিত করে। এই বিশিষ্ট দার্শনিকভঙ্গীকে হয়ত দর্শনসম্মত কোনো তত্ত্বপরিকল্পনার পর্যায়ভূক্ত করা যাবে না। কিন্তু তিনি তাঁর বিপুল বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে রেখে গেছেন বিশ্ববীক্ষা ও দার্শনিক ভাবসজ্জার এমন একটি প্রচ্ছন্ন প্রয়াস যার অবলম্বনে ও আশ্রয়ে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রবীন্দ্রদর্শনের অবয়ব গঠণ করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সৃষ্টিকে এমন একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবিচ্ছন্ন রশ্মিতে নিয়ত আলোকিত রেখেছিলেন যা তাঁর একান্তই স্বকীয়-আপন জ্যোতিতে সতত সমুজ্জল। তাঁর দার্শনিক চিন্তার অনন্য মৌলিকতা বিশেষ করে উপনিষদ, বৌদ্ধধর্ম ও বৈষ্ণববাদের অনুপ্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ তর্ক বা বিচারের মাধ্যমে কোনো দার্শনিকতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেননি কারণ, তিনি ছিলেন মূলত কবি। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রী রাধাকৃষ্ণন বলেন:

> *'Rabindranath is essentially a poet and not a philosopher, though it is possible for as together his philosophical views from his poetry'.* (Radhakrishnan, 1961 : 76)

কাব্য ও দর্শন এই দুই এর প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিন্নতা তাঁকে যুগপৎ কবি ও দার্শনিক করেছে। তাঁর অন্তর্দিকের প্রবর্তনা যেমন তাঁকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী করে তুলেছিল তেমনি তাঁর বর্হিদিকের আভিমুখিতাকে তিনি কাব্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এজারা পাউন্ডের মতো তিনি মনে করেননি, *'Poetry is an act of controlled intelligence'* (Radhakrishnan, 1961 : 77)। অনুভূতির মুক্ত প্রকাশই তাঁর কাছে কাব্য। তাঁর বিশ্বাস এই কাব্য ও দর্শন থেকে বিযুক্ত হতে পারে না। শ্রী হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়ও বলেছেন, তাঁর কাব্য রচনায় অনেক অংশ দার্শনিক তত্ত্বকনিকা বুকে ধারণ করে আছে, দার্শনিক তত্ত্বই তাদের আধেয়। 'Personality' বক্তৃতামালায়ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থ দার্শনিকের ভঙ্গীতেই বলেছেন: *"When we say that art deals with truths that are personal, we do not exclude philosophical ideas which are apparently abstract*". (Tagore, 1917 : 25)। অনুরূপভাবে দর্শন তাঁর কাছে শুধু বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বা যুক্তির বিন্যাস নয়। তাঁর দর্শন তাঁর ধর্ম। আর এই ধর্মকে মানুষ ও তার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি বলেছিলেন, 'সেই ধর্মকে জীবনের

মর্মকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, উদ্‌ঘাটিত করে, স্থির করে দাঁড় করিয়ে দেখা ও জানা আমার পক্ষে অসম্ভব’। (ঠাকুর, ১৩২৪ : ২০৩)। তাই মানবিক অনুভূতি ও অনুভূতির উপর তাঁর দর্শন প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনে করতেন, সত্যের প্রকাশে বন্ধুতা চাই, নিজেকে ভাল লাগা চাই এবং একমাত্র ‘আমি আছি’র প্রকাশ ‘আমি আনন্দিত’ এর মধ্যে। কারণ, তাঁর দার্শনিক পথ সামঞ্জস্যের পথ, ঐক্যের পথ, প্রেমের ও মিলনের পথ। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন:

> *‘We have seen that consciousness of personality begings with the feeling of the separateness from all. It is needless to say that with the consciousness of separation there must be consciousness of unity, for it cannot solely by itself’.* (Tagore, 1917 : 97)

রবীন্দ্রদর্শন সামঞ্জস্যবোধকে কেন্দ্র করে গঠিত। শুধু তাই নয়, সামঞ্জস্যই তাঁর কাছে পরমসত্তার প্রকৃতি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এই দুই প্রত্যন্ত সীমায় দুটি ভিন্ন জগত সৃষ্টি হয়েছে। সামঞ্জস্যবোধ রবীন্দ্রনাথকে এনে দিয়েছে পূর্ণ প্রাণের রস সিঞ্চিত আনন্দের আলোকিত বিশ্বে। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের আনন্দের বাণীকে তাঁর দর্শনের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসেছিলেন। সর্বানুভূ পরমসত্তাও তাঁর কাছে আনন্দরূপেই প্রতিভাত হয়। তাঁর মুক্তিচেতনাও এই আনন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ভাষায়:

> *‘বিশ্বের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব – নিজের মধ্যে তার প্রকাশকে অবাধে উপলব্ধি করেই আমি মুক্ত হব। ভববন্ধন অর্থাৎ হওয়ার বন্ধন ছেদন করেই মুক্তি নয়– হওয়াকেই বন্ধনস্বরূপ না করে মুক্তিস্বরূপ করাই হচ্ছে মুক্তি। ধর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি’।* (ঠাকুর, ১৩২৪ : ২৯০)

এ পৃথিবীতে মানবজীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ দার্শনিক ঐতিহ্যের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তিনি পেয়েছিলেন উপনিবেষদের আনন্দ দর্শনের ঐতিহ্য এবং তার পারিবারিক আবহাওয়ায় একটি মুক্তচিন্তার পটভূমি। আর এই আনন্দ ঐতিহ্যপূর্ণ পটভূমি জীবন-জগত ও সমাজের বিরোধযুক্ত প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুন্দরের মূল্যায়ন করেছেন বিভিন্নভাবে। ফলে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, সুন্দর-অসুন্দর এবং অসীমতা ও সসীমতার ধারণা, দার্শনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আলোচনার বিভিন্ন পর্বে সৃষ্টি হয়েছিল বিভিন্ন সমস্যা। পরমসত্তার এসব পরিপ্রেক্ষিতে সসীমতার রূপ একদিকে যেমন জটিলতর হয়েছে অন্যদিকে সসীমতাকে অতিক্রম করার আদর্শ হিসেবে অসীমতার প্রকৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে

নানাভাবে। ইউরোপের গীতিকবি হিসেবে পরিচিত রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল সত্য-সুন্দরের কল্পনায় স্বাভাবিকভাবে আচ্ছন্ন। এ প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *'যেমন খন্ডভাবে আমরা জগতের মধ্যে অসংখ্য কদর্যতা দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমস্ত যগৎ মহাসৌন্দার্যে প্রকাশিত-তেমনি খন্ডভাবে সংসারে পাপতাপের সীমা নাই, তথাপি সমস্ত অবিচ্ছিন্ন মঙ্গলসূত্রে চিরদিন ধৃত হইয়া আছে"।*
> (ঠাকুর, ১৩২৪ : ৩১)

কিন্তু জীবন ও সমাজে নানা অসুন্দর ও বিরোধযুক্তির উপস্থিতি তাঁর চেতনাকে যথার্থভাবে যুক্তিনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণধর্মী করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন দার্শনিকের অভিমত আলোচনা করা প্রয়োজন। যাঁরা মনে করেন, 'আদর্শ' (Ideal) মানুষের পরিবেশ সাপেক্ষ বিষয়, যা ব্যক্তিগতভাবে সত্য। দার্শনিক লোটজে (Lotze) মনে করেন, 'আদর্শ' হলো অনুভূতির প্রকাশমাত্র। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কোনো পৃথক অস্তিত্ব নেই, পরমসত্তার সঙ্গে সে সম্পৃক্ত। পরমসত্তা শূন্যগর্ভ নয়, সমগ্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই পরমসত্তার সামঞ্জস্যে বিধৃত। পরমসত্তা সমগ্র সম্পর্কের অতীত। সূতরাং চিন্তার উর্ধ্বে পরমসত্তার অবস্থিতি। (Chatterjee, 1964 : 44)। আধুনিক দার্শনিক বেনেডিক স্পিনোজার (Benedict Spinoza) মতে, পরমসত্তা তাঁর অস্তিত্বের জন্য কারো উপর নির্ভর করে না। যার অস্তিত্ব কোন কিছুর ওপর নির্ভর করে না তাই দ্রব্য বা ঈশ্বর বা পরমসত্তা। এ অর্থে দ্রব্য কখনই একাধিক হতে পারে না। স্পিনোজার মতে, এই দ্রব্য হলো ঈশ্বর। চিন্তা এবং বিস্তৃতি কোন পৃথক দব্য বা ঈশ্বর নয়। এরা দ্রব্য বা ঈশ্বরের অসংখ্য গুণের মধ্যে দু'টি গুণ মাত্র। এ দুটি গুণের আড়ালে দ্রব্য নির্বিশেষে অসীমরূপে বহমান। এই বহমান দ্রব্যই হলো ঈশ্বর বা পরমসত্তা। পরমসত্তাই একমাত্র মুখ্য দ্রব্য এবং কেবল শুধু দ্রব্যই নয়, বিশ্বের মুখ্য দ্রব্যই পরমসত্তা। সমগ্র বিশ্বেই পরমসত্তা, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সামগ্রিক সৌন্দর্যই পরমসত্তা, মানুষ সেই পরমসত্তাকে অর্জন করতে চায়। (Russel, 1954 : 94)। নব্য বস্তুবাদী দার্শনিক পেরী (Parry), প্রয়োগবাদী দার্শনিক উইলিয়াম জেমস (William James), এমনকি প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকরাও এ মর্মে 'আদর্শ'কে আপেক্ষিক মন-নির্ভর ব্যক্তি কেন্দ্রিক ঘটনা বলে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অভিমতের বিরুদ্ধে অন্যান্য দার্শনিকদের অভিমত ছিল মানসিক চাহিদা কামনা-বাসনা, ইচ্ছের মূল্য স্বরূপত; মন-নিরপেক্ষ বাস্তব ঘটনা বিশেষ। যুক্তির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন "আদর্শ" নিছক মানসিক অনুভূতি নয়, বস্তুর প্রকৃতিকে প্রকাশ করে থাকে। তাঁর মতে, শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতেও ঘটে বস্তু সাপেক্ষ অনুভূতির প্রকাশ। এটি কেবল কল্পনাপ্রসূত

বিষয় নয়। বস্তুতে এমন কিছু উপাদান থাকে যা বস্তু সম্পর্কে আমাদের ইচ্ছা বা বাসনাকে নির্দিষ্ট করে। “সাহিত্যের প্রাণ” শীর্ষক আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেন, সাহিত্য কেবল প্রকৃতির আলোকচিত্র নয়, এটি আমাদের আবেগের মধ্য দিয়ে বাস্তব প্রকৃতির প্রকাশ বিশেষ। (আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), ২০০১ : ৪৫)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের মানুষের মধ্যে এই পরমসত্তার আদর্শকে দেখতে পেয়েছিলেন। বুদ্ধিতে, কর্মে, প্রেমে, ভূমানন্দে জাগরিত মনুষ্যত্বের সাধনাই তাঁর নিকট “পরমসত্তার” সাধনা। এই “পরমসত্তা” অনন্তস্বরূপ। মানুষের ধর্মই এই অনন্তের সাধনা ছাড়া মানব অস্তিত্ব নিরর্থক। আদর্শের এই বস্তুগত বিশ্লেষণের সমর্থনে প্রতীচ্য দার্শনিকদের যুক্তি উল্লেখ করে বলা যায় মূল্যাবধারণ হলো সার্বজনীন বিষয়। দার্শনিক জি.ঈ ম্যূর (G.E. Moore) এবং এন হার্টসম্যান “আদর্শের” বাস্তবতাকে স্বীকার করেন। কারণ, ‘আদর্শ’ বাস্তব ঘটনার নির্দেশ দেয়। ম্যূরের মতে, ‘আদর্শ’ হলো অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ বস্তুগত বিষয়। হার্টস্‌ম্যান মনে করেন, ‘আদর্শের’ কল্পনা ও বাসনা নিরপেক্ষ স্বাধীন অস্তিত্বে বর্তমান। (রায় (সম্পাদিত), ১৯৯২ : ৫৭)। ‘আদর্শ’ হলো মন নিরপেক্ষ বাস্তব ঘটনা। অবশ্য ‘আদর্শ’ ব্যক্তিগত ও বিষয়গত এই দুই বিরুদ্ধ ধারণার সমন্বয় ঘটিয়ে আধুনিক বাস্তববাদী দার্শনিক আলেকজান্ডার মন্তব্য প্রকাশ করে বলেন, ‘আদর্শ’ হলো ব্যক্তি নির্ধারিত বস্তুগত গুণ বিশেষ। তাই ‘আদর্শ’ সব সময় বাস্তব সত্তা সাপেক্ষ। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, ‘আদর্শের’ অস্তিত্ব বতর্মান। দার্শনিক হার্টস্‌ম্যানের মতো তিনিও মনে করেন মানব-মন মূল্যের স্রষ্টা নয়, মানুষ বাস্তবে-এর অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। রবীন্দ্রদর্শনে বাস্তব সত্য হিসেবে পূর্ণ সত্যের ধারণাই আদর্শবোধের আশ্রয়। সত্য হলো বিভিন্ন আদর্শের সমন্বয়, যা পরম আদর্শ হিসেবে মানব জীবনে প্রকাশিত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রদর্শনে আদর্শ সমন্বয় এবং বাস্তব আশ্রয় হিসেবে পূর্ণ সত্যের ধারণাটির সমর্থনে দার্শনিক টেরোলের (Tyrrell) অভিমতটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর মতে, *“The Absolute contains all finite existence and contains it as a perfectly harmonicas system”.* (Aristotle, 1951 : 394)। ‘আদর্শের’ বাস্তব অস্তিত্ব হিসেবে সুন্দরের বিশ্লেষণ করে মানব সত্যের যথার্থ তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মানবিক আদর্শ সুন্দরের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার আদর্শস্বরূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন:

> *‘কদর্যতা বিরোধ, মৃত্যু, অমঙ্গল এবং অসত্য খন্ডতার পরিণাম। রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন চরমসত্তার সামগ্রিক রূপের আধার সেই ‘এক’কে, এই ‘এক’কে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে সহস্রের হাত হইতে আর আপনাকে রক্ষা করিতে পারি না’।* (ঠাকুর, ৩১)।

রবীন্দ্রদর্শনে সত্যের প্রকাশ ঘটেছিল দুভাবে- এক: সসীম ও বহু এবং অন্যটি ছিল পরমসত্তা যা এক ও পূর্ণ। রবীন্দ্রদর্শনে এই পরম সত্যই হলো পরম আদর্শের চরম আশ্রয়। যা নানা তথ্য ও ঘটনার মধ্য দিয়ে মানবজীবনে ও সমাজে প্রকাশিত হয়ে থাকে। এই প্রকাশের অর্থ ছিল সসীম জীবনের নানা 'আদর্শ' রূপায়নের মধ্য দিয়ে পরম সত্যের উপলব্ধি। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *'আমার এক টুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হতো তাহলে মনের সঙ্গে মনের কোনো যোগই থাকত না। মন পদার্থটি জগৎব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ রয়েছে বলেই সেটা খন্ডিত তা নয়। সেই জন্যই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব রয়েছে'।* (ঠাকুর, ৫৬৩)।

মানবজীবনের এই পূর্ণতা সন্ধানের অর্থ ছিল একদিকে তাঁর জীবনের পরম আদর্শ, সুন্দর ও বিরোধমুক্তির প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে এর আশ্রয়ে পরম সত্যের উপলব্ধি। এ অর্থে জীবন, আদর্শ ও সত্য হয়ে ওঠে একান্তভাবেই ঘনিষ্ঠ। মানবজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক আদর্শ ও সত্য হয়ে ওঠে মানব সত্য। দার্শনিক প্রিঙ্গল প্যাটিসন যথার্থভাবে বলেছেন, চেতন অভিজ্ঞতার উপলব্ধি সত্য, সুন্দর ও আদর্শের কোনো অস্তিত্বে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, সত্য ও আদর্শের এই চৈতন্যময় উপলব্ধির তাৎপর্য ছিল জীবনের প্রতিটি স্তরেই সত্যের প্রকাশকে অনুভব করা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *"Truth is everywhere, therefore, everything is the object of our knowledge, beauty is omnipresent, therefore everything is capable of giving us joy".* (Tagore, 1961 : 14)

রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্যের উপস্থিতি যেহেতু সর্বত্রই ঘটেছে তাই সবকিছুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়ে পড়ে। সুন্দর যেহেতু সর্বত্র বিরাজিত, তাই সবকিছুই আমাদের আনন্দ। সত্য, সুন্দর ও আদর্শের জ্ঞান মানব জীবনের সর্বত্র প্রকাশ করে পরিপূর্ণতার ধারণা, যেটি সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান নয়। এটি হলো স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, যা সত্য, সুন্দর ও আদর্শরূপ আরোপ করেছিলেন দার্শনিক রস, ইউয়িং এবং আরো অনেকেই। রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের সজ্ঞায় এই পরম আদর্শের উপলব্ধির অর্থ ছিল অসীম পরমসত্তার উপলব্ধি। যেটি মানবিক আদর্শের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেন:

> *"অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছে সেখানেই অহংকার। সোহহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার*

মধ্যে অসীম বলেছেন অহমস্মি। আমি আছি এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা"। (ঠাকুর, ৫৬৪)।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য আলোচনায় স্বজ্ঞালব্ধ জ্ঞানকে মানুষের আন্তর সৌন্দার্যরূপে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই আন্তর সৌন্দার্যই আদর্শের যথার্থ স্বরূপ, যা মানুষের উদ্বৃত শক্তিতে উপস্থিত থাকে এবং তার নানা সৃষ্টিশীল ধর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্য দিয়ে সুন্দর বা আদর্শের অভিব্যক্তির মধ্যেই ঘটে মানুষের অসীম সত্তার উপলব্ধি। আধুনিক যুগের শেষ পূর্ণতাবাদী জার্মান দার্শনিক হেগেলের (Hegel) মতে, যে জ্ঞানরূপ ও প্রকাশের মধ্য দিয়ে আমাদের চিন্তা বিকাশিত হয়, তা শুধুই মানবিক অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, প্রকৃত পরমসত্তার মধ্যে তার প্রকাশ। (Passmore, 1961 : 69)। হেগেল একটি অভিনব দার্শনিক রীতির উদ্ভাবন করেছিলেন, যা দর্শনের ইতিহাসে "ডায়ালেকটিক্যাল মেথড" নামে পরিচিত। হেগেলের মতে, পরমসত্তা হলো পরম আদর্শ। তার মাধ্যমে সকল দ্বন্দ্বের নিরোসন হয়। তবে এই সত্তা দ্বান্দ্বিকভাবে জগতে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তিমন পরম দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে পরমসত্তার ধারণায় পৌঁছিতে পারলে পরমসত্তা এবং পরম আদর্শের সন্ধান পায়। হেগেল বিমূর্ত নৈতিক ভাববাদী আদর্শমালার অকার্যকারিতায় ক্ষুদ্ধ হয়েছিলেন। ইতিহাসের ব্যাপক পর্যালোচনা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, জগতে যাবতীয় বিপত্তির মূলে রয়েছে *"Unhistorical abstraction"* -এর প্রতি মানুষের অবস্থা। ব্যক্তিগত নীতিমালার ভিত্তিতে সবাই তার কর্তব্য পালন করে গেলও সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নানা জটিল সমস্যার সমাধান সুগম হবে না, বরং ব্যক্তি ভিত্তিক অজস্র বিরোধের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

> *"In the morality of consciousness, duty in general is mine a free agent at the same time a right of my subjective will or disposition. But in this individualist moral sphere, there arises the division between what is only inward purpose, which only has its being in me and is merely subjective duty and the actualization of that purpose".* (Ryle, 1929 : 220)

কর্তব্য নির্ধারণের জন্য হেগেল তাই ব্যক্তির ভাববাদী নীতিমালা নয়, অস্তিত্বের মধ্যে নিরন্তর "হ্যাঁ" এবং "না" -এর যে দ্বন্দ্ব চলছিল তাকে অনুধাবন করার উপর জোর দিয়েছিলেন অধিক এবং ব্যক্তিকে অতিক্রম করে ইতিহাসের যে অনিবার্য বিধান কিংবা রাষ্ট্রীয় শক্তির বিকাশ ঘটেছিল তার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। যাহোক, এই রীতির প্রয়োগ করে হেগেল প্রকার থেকে প্রকারান্তরে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এভাবে তিনি সর্বনিম্ন প্রকার সত্তা থেকে

সর্বোচ্চ প্রকার চূড়ান্ত পরমসত্তায় তাঁর দর্শনের ব্যাপকতম অধিষ্ঠানটির পরিকল্পনা করেছিলেন। একই দ্বান্দ্বিক রীতিতে চৈতন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত বস্তুজগতের বিকাশও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হেগেল তাঁর যুগান্তকারী দর্শনে দেখিয়েছিলেন মানবেতিহাস থেকে শুরু করে মানুষের সমগ্র জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও নীতিবিজ্ঞানের অভিব্যক্তি এই দ্বান্দ্বিক রীতিকে অনুসরণ করে চলেছে। তাঁর আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে পরম আদর্শের উপলব্ধি ঘটে। আত্মার উন্নতির জন্য প্রয়োজন উন্নততর মানবিকবোধ এবং নশ্বর দেহ ও মিম্নতর কামনাগুলোকে ত্যাগ করা। এ কারণেই হেগেল উল্লেখ করেছিলেন যে, "বাঁচার জন্য মরার" (Die to live) অনুস্মরণীয় বাক্যটি। এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন ক্ষুদ্র, সাধারণ, ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক সংযুক্তি। এর ফলে আমাদের জীবনে অসীম সত্তার উপলব্ধি ঘটবে। চরম হিন্দুত্ববাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী কিছু কিছু চিন্তাবিদদের মতো মানবীয় জ্ঞান, কর্ম ও এষণা থেকে অসীমসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে তিনি উৎসাহী ছিলেন না। তাই তিনি কর্মের বিশেষণ প্রয়োগ করে বন্ধনের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *"আমরা বলি, মানুষের কর্মমাত্রেরই চরম লক্ষ কর্ম হইতে মুক্তি।*
> *- এবং মুক্তির উদ্দেশ্যে কর্ম করাই ধর্ম"।*
> *- তিনি বলেছেন। আরো বলেছেন "তাই বলছিলুম কর্মকে ত্যাগ করা নয়, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের কর্মকেই চিরদিনের সূত্রে ক্রমশ বেঁধে তোলবার সাধনাই হচ্ছে সত্যের, ধর্মের সাধনা"। সমস্ত কর্মের দ্বারা আত্মা আপনাকে ব্রহ্মে নিবেদন করতে থাকবে"।* (ঠাকুর, ২৪৬)।

রবীন্দ্রনাথ কর্মের ঐক্য চাননি, চেয়েছিলেন ভোগের ঐক্য। তিনি কর্মের একাকীত্বকে আদর্শায়িত করে তার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের অধিপতি শ্রেণির কর্মবিমুখ ভোগবিলাসী মানসিকতাকে প্রকাশ করেন। কর্ম মাত্রেই হিতকার ও সামাজিক এবং অসামাজিক কর্ম সাধারণ অনিষ্টকর হয়। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ভারতবর্ষ কর্মক্ষেত্রে অসামাজিক। সেই জন্যই সে অনগ্রসর। জীবনবিমুখ। শঙ্করাচার্জ প্রমুখ অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা যে পথে নির্বিশেষ একত্বের মধ্যে চিদানন্দের উপলব্ধির পথে সাধনা করেছিলেন সেই পথ রবীন্দ্রনাথের নয়। তাঁর ভাববাদী দর্শনে রূপচেতনা ও পরমসত্তার অপরূপের উপলব্ধি, এ দু'য়ের এক অপরূপ সমন্বয় লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন: *"চোখে দেখার মধ্যে সম্পূর্ণতা নেই তা "হ্যাঁ" এবং "না" -এ খন্ডিত, তার মধ্যে পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা নেই তা ভালোও দেখে মন্দও দেখে, খানিকটা দেখে, সে দেখে কিন্তু শোনে না"।* (ঠাকুর, ১৩২৪ : ২৫৭)। আবার অদ্বৈতবাদীদের পরমসত্তার সাধনার পথ থেকেও তাঁর চিন্তাধারা ভিন্ন

ছিল। পরমসত্তায় লীন হবার সাধনা তাঁর দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্যহীন। ভারতীয় সাধনার এই দিকটির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখে তিনি বলেছিলেন:

> *"It is widely known in India that there are individuals who have the power to attain temporarily state of Samadhi, the complete merging of the self in the infinite, a state which is indescribable while accepting their testimony as true, let us at the same time have faith in the testimony of others who have felt a profound love which is the intense feeling of union for being who comprehends in himself all things that are human in knowledge, will and action".* (Tagore, 1961 : 128)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরমসত্তাকে পেয়েছিলেন বর্জন ও বিলোপের মধ্যে নয়, খন্ড ও অখন্ড, সীমা ও অসীমের এক সামঞ্জস্যপূর্ণ দ্বৈত অবস্থানের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *'কারণ, দূরের দ্বারা নিকট বর্জিত, নিকটের দ্বারা দূর বর্জিত, থামার দ্বারা চলা বর্জিত এবং চলার দ্বারা থামা বর্জিত, অন্তরের দ্বারা বাহির বর্জিত, বাহিরের দ্বারা অন্তর বর্জিত। কিন্তু সামঞ্জস্যস্বরূপ ব্রহ্ম? তিনি চলেন অথচ চলেন না, তিনি দূরে অথচ নিকটে, তিনি সকলের অন্তরে, অথচ সকলের বাহিরেও'।* (ঠাকুর, ১৩২৪ : ৬০৩)।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরমসত্তারূপী ঈশ্বর ও ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় ধৃত রূপচেতনার জগতের মধ্যে তিনি অংশকে সমগ্রবিচ্ছিন্ন সত্তা বলে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মানবসত্তার মধ্যে সত্য, সুন্দর ও আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়ে এক ঐক্যের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই অর্থে সত্য, সুন্দর ও বিরোধমুক্ত আদর্শ হয়ে পড়েছিল যথার্থভাবে মানবিক, যা একান্তভাবে ব্যক্তি ও সমাজ সাপেক্ষ। তিনি মনে করেন, সাধারণ মানুষের জীবন হয়ত ক্ষুদ্র স্বার্থের আকর্ষণে পরিচালিত। সে কারণে সমাজ জীবনে বিরোধ সৃষ্টি হয়। কিন্তু 'আন্তর সৌন্দর্য' হিসেবে পরমসত্তার আদর্শ সহজভাবেই মানুষকে স্বার্থশূন্য কর্মে নিয়োজিত করে। ফলে বিরোধমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে সবার সঙ্গে একান্তভাবে মিলিত হবার চেষ্টা করে। কর্মে, চিন্তায় ও জীবনে যথার্থভাবে প্রেম ও ঐক্যের অনুভূতি রবীন্দ্র দৃষ্টিতে পরম বিরোধমুক্তির উপলব্ধি। সুতরাং স্বার্থশূন্য কর্মের অর্থ ছিল জীবনে সত্য ও সুন্দরের প্রতিষ্ঠা। তাইতো জার্মান বিচারবাদী দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট বলেছিলেন, "স্বার্থমুক্ত তৃপ্তিই হলো সৌন্দর্যতা"। (Russel, 1954 : 137)। এ অর্থে রবীন্দ্র চেতনায় স্বার্থশূন্য প্রেম ও কর্মের যথার্থ তাৎপর্য ছিল সত্য, সুন্দর ও আদর্শের সমন্বয়, যা ভারতীয় দার্শনিক গৌতম বুদ্ধের 'মৈত্রী'-এর ধারণাটির

নির্দেশ দেয়। এই মৈত্রীর অর্থ ছিল শুধু মানুষ নয়, সমগ্র সৃষ্টিকূলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই সমন্বয় রবীন্দ্রনাথের মতে, মানুষের অন্তরের 'উদ্ধৃত' শক্তিতে অস্তিত্বশীল, যে বিরোধমুক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অন্তরের সৌন্দর্য। মানুষ যখন তার বিরোধকে অতিক্রম করে সমন্বয়ের উপস্থিতি অন্তরে অনুভব করে তখন সে পরমসত্তার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। তিনি মনে করেন, প্রেমই জীবনের বৃহত্তর উপলব্ধিকে সম্ভব করে তোলে। কারণ, প্রেমই একমাত্র বিরোধমুক্তির আশ্রয়। এই অর্থে মানবিক ঐক্য উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে পরম বিরোধমুক্তির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় পরমসত্তার বিকাশকে সম্ভব করে তোলে। সামগ্রিকভাবে মানব অস্তিত্বের এই অবস্থানটিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন:

> *'এক আত্মার সঙ্গে আর এক আত্মার যে সমন্ধ সকলের চেয়ে নিবিড় সকলের চেয়ে সত্য, তাকেই বলে প্রেম। ভৌতিক বিশ্বের সঙ্গে বাস্তবে আমাদের পরিচয় ইন্দ্রিয়বোধে, আত্মিক বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সত্য পরিচয় প্রেমে'।* (ঠাকুর, ৫৮৫)।

রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রেমের মধ্যে জাগতিক সত্তায় পরমসত্তার উপলব্ধি। মানবপ্রেম ও আদর্শকর কর্মের মধ্যে এর প্রকাশ। তার মধ্যে স্বার্থশূন্য প্রেমের অভাবে মানুষ সবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়। এভাবে ঐক্য ও বিরোধমুক্তির আদর্শ মানবজীবনে প্রকাশিত হয়। সুতরাং কর্ম, চিন্তা, প্রেম এবং ঐক্যের অনুভূতি রবীন্দ্র দৃষ্টিতে পরম আদর্শের উপলব্ধি। প্রেম ও আদর্শকর কর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সমস্ত সৃষ্টিশীল সত্তায় অসীমের স্ফরণ ঘটায়। বিশ্ব যে বহুসত্তা বিশিষ্ট নয়, একের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শান্তিনিকেতন" নামক স্বকীয় উপনিষদের দার্শনিক প্রতীতিতে অসংখ্যবার ব্যক্ত করেছিলেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত বক্তৃতামালায় ভারতীয় সাধনার এই দিকটির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখে তাঁর *"Personality"* -তে তিনি যথার্থ দার্শনিক ভঙ্গিতে বলেছেন:

> *"If we have to give an answer in the affirmative our whole nature rebels. For we know that in us the principle of oneness is the basis of all reality, therefore, through all his questionings and imaginings from the dim dawn of his doubtings and debates, man has come to the truth, that there is one infinite centre to which all the personalities and therefore all the all the world of reality, are related."* (Tagore, 1917 : 98-99)

রবীন্দ্রনাথ 'অবন্ধ্য' দার্শনিক নিপুনতায় সেই "এক" এর সঙ্গে বৈচিত্রকে যুক্ত করেছিলেন। এর তথ্য পেয়েছিলেন তিনি উপনিষদ থেকে। উপনিষদের বীজমন্দ্র 'আনন্দ'কে তিনি তাঁর দর্শনের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে এসে 'এক' কে 'বহু' এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। এমনকি তিনি সমস্ত বৈচিত্রকে এই 'আনন্দ' ও

'এক' এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পরমসত্তা শুধু সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ নয়, তিনি আনন্দস্বরূপও। মানুষের ধর্ম অনন্তের সাধনা, এই অনন্তের সাধনা ছাড়া মানব অস্তিত্ব নিরর্থক। রবীন্দ্রনাথ সত্যের প্রকাশকে দেখেছিলেন সামঞ্জস্য ও মিলনের মধ্য দিয়ে। তাঁর ভাববাদে অনন্ত সম্ভাবনাময় 'অব্যক্ত আমি'-র বেশে উপস্থিত এক ধরণের ধর্মবোধের স্পর্শ হয়ত আছে, কিন্তু এই ধর্মবোধ এক অনন্য মানবতাবোধেই সমুজ্জল। ফরাসী বিজ্ঞানী সা জাঁ পার্স পরমসত্তাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করতে গিয়ে বলেছিলেন:

> *'রবীন্দ্রনাথকে আমরা চিনেছি তাঁর সামগ্রিক অধ্যাত্মবাদের মানবিক গুরুত্বের জন্য। তাঁর ললাট মহত্বের যুগলচিহ্নে উদ্ভাসিত। তিনি কবি। তিনি তাঁর স্বপ্নের প্রাচীনতাকে উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন কিন্তু সমকালীন মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। অনন্তস্পৃষ্ট তাঁর কাব্য কালসীমায় অথবা গৃহগন্ডীতে বদ্ধ নয়। সেই কাব্য মানুষের পদক্ষেপে তার নিজের পরিচিত উৎসটি খুঁজে পায় এবং সেই সঙ্গে খুঁজে পায় মৃত্তিকার সেই খেয়াঘাটটি যেখানে মানুষের রাত্রির অবসান'।* (বন্দোপাধ্যায়, ১৩৬৩ : ১৯-২০)।

তিনি অনাগতকালের পরমসত্তার দিকে চেয়ে থেকেছেন, জয় ঘোষণা করেছিলেন সংশপ্তক 'পরমসত্তার'। সমগ্র ক্রমবিকাশ জুড়ে প্রথম প্রাণকনিকা থেকে শুরু করে মানবীয় ভাবের উৎকর্ষ পর্যন্ত তিনি এক পরম অর্থের সন্ধান করেছিলেন। মানুষের অগ্রগমনের পথ তার অন্তরের দিকে ক্রম প্রসারিত। অভিব্যক্তির পথে এ যেন একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যাওয়া। মানুষে এসেই সমস্ত সৃষ্টি তার ভূমায় অর্থময় হয়ে উঠে এবং 'পরমসত্তার' উদ্বোধনের মধ্য দিয়েই তিনি সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য দেখতে পান। তাঁর সমগ্র নৈতিক মূল্যবোধ এই পরমসত্তার ধারণা থেকে উৎসারিত। বিভিন্ন পূর্ণসত্তার চিন্তাধারার আলোচনার প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের একান্তই স্বকীয় ভঙ্গিতে 'পরমসত্তার' স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আশা করি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে শুধু এক নতুন ভাববাদের উদ্ভাবক তা নয়, 'মানবতান্ত্রিক' চিন্তাধারার ক্ষেত্রেই তাঁর অনন্যতন্ত্রতা অনস্বীকার্য। তাঁর 'মানবতাবাদের' স্বরূপটি তাঁর বিশিষ্ট ভাববাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বস্তুত তাঁর ভাববাদের স্বাভাবিক উত্তরণ ঘটেছিল তাঁর মানবতাবাদে। সর্বাঙ্গীনভাবে তিনি 'মনুষ্যত্বের' অখন্ডতা নিয়ে বেঁচে থাকার মহান পন্থাটির সন্ধান করেছিলেন। মানুষের ধর্ম তার অসীম উদ্ধৃত্বে, সেখানেই পায় সে তার 'পরমসত্তার' সন্ধান -তাঁর পরমসত্তাবাদের এই মূল সূত্রটি তাঁর সমগ্র দার্শনিক ভাবধারায় একটি অনবদ্য সংহতি এনে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কাব্যে পরাভাব, উৎকণ্ঠা, মৃত্যুশাসিত জীবনের নিরর্থকতা প্রভৃতি

আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত বিক্ষেপ লক্ষ্য করেছিলেন কোনো কোনো বিশিষ্ট রবীন্দ্রসমালোক। পরমসত্তার সমগ্রতা ও সংশ্লেষের যে দর্শন তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিলেন 'আপন আলোকে, ধোত' অন্তরে তা এ পর্বের কাব্যে কিছুটা সংশয়াক্রান্ত বলে প্রতিভাত হয়েছে অনেকের কাছে। কিন্তু তাঁর শেষ জীবনের কিছু মুহূর্তের কালাক্রান্ত অনুভবকে তাঁর সামগ্রিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অতিক্রমী সত্য বলে মনে করা অযৌক্তিক। 'উদাসীন জগতের ভীষন স্তব্ধতা' তাঁর রোগসয্যায় আতঙ্কের অনুভূতি এনে দিলেও তিনি আবার অনুভব করেছিলেন 'শূন্য', তবু সে তো 'শূন্য' নয়। ইহজগতের নিস্করণ ও ঔদাসীন্যের মধ্যে জ্যোতির্ময় ভাবরূপী সত্তার আবির্ভাবের রহস্য তাঁর উত্তরকাব্যে অধীর জিজ্ঞাসায় আবর্তিত হয়েছে:

'সত্তা আমার, জানিনা, সে কোথা হতে হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরাম্ভ মাঝে কেন্দ্র বচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানিনা কে কৌতুকী'।

(ঠাকুর, ৮৪৭)।

'কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা' যে সত্তা নিয়ে এল তা কার জন্য এই প্রশ্ন তাঁকে আমৃত ভাবিত রেখেছিল। কিন্তু দার্শনিকদের বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও বুদ্ধির আশ্রয়ে সত্তার সন্ধান যে অন্তহীন, পরমসত্যে উপনীত উত্তরপর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তা বহুবার ব্যক্ত করেছেন। যুক্তি ও বুদ্ধির প্রদীপ হাতে নিয়ে অগ্রসর হয়ে পুরাতন প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর না পেয়ে সহজ উত্তরটি তিনি খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁর সহজ বিশ্বাসেই:

"তোমার জ্যোতিস্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল" । (ঠাকুর, ৯০৪)।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষ তার জ্ঞানের মাধ্যমে যে তত্ত্ব পায় পরমসত্তার পরিচিতি সেখানেই নয়, মানুষ বিশ্বজগতকে যেখানেই তার অনুভূতির মধ্যে আত্তীকরণ করেছে সেখানেই পরমসত্তার অধিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যে মানুষ ও তার জগত এবং পরমসত্তা পরস্পরে প্রবিষ্ট, সঞ্চারণশীল, এমনকি বিনিময়ধর্মী, যে সম্পর্কসূত্রে তারা সম্পৃক্ত তা কিন্তু তত্ত্বগত বা শাস্ত্রীয় নয়, ঈসা (আঃ) অথবা রামকৃষ্ণ ঠাকুরের মতো কোনো অবলম্বন খোঁজেননি,

খুঁজেছিলেন ব্যক্তিগত ও অনুভূত সত্যকে। এ সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *“Personality”* গ্রন্থে বলেন:

> *“Man as a knower, is not fully himself-his mere information does not reveal him. But as a person, he is the organic man, who has the inheren power to select things from surroundings to make them his own.”* (Tagore, 1917 : 13)

আনন্দ ছাড়া পরমসত্তার প্রকাশ সম্ভব হতো না। এই আনন্দ বস্তুত তাঁর উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর মর্মকেন্দ্র। আনন্দ ছাড়া বিশ্বসত্তার প্রকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ নিরীশ্বরবাদী কিংবা অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন না, তাঁর জগতপ্রেমের মূলে ছিল এক গভীর আস্তিক্যবোধ, সবকিছুর মধ্যে তিনি অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর কাছে কোনো ধর্মমতে বাঁধা ছিল না। প্রতীচ্যের হেগেল ও তাঁর অনুগামী ভাববাদীদের মতো তিনি বিশ্বকে কেবলমাত্র ভাবরূপী সত্তা বলেই ক্ষান্ত হননি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাব ছিল তাঁর কালের লীলাধর্মী, যে লীলায় ছিল, প্রীতি, রস ও আনন্দ। এই প্রীতি, রস ও আনন্দের ধারণা প্রতীচ্যের ভাববাদী দর্শনের রীতিবহির্ভূত। তিনি আনন্দকে আশ্রয় করে ভাববাদের ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। কবির আপন জীবন সৃষ্টি, অনেকটা তাঁর ব্যক্তি অনুভূতিনির্ভর উপলব্ধি ভিত্তিক আস্তিক্যবাদী ধর্মের কথা। মানবসত্য ও মানবজীবনের রসবোধই তাঁর প্রধান অঙ্গ। কিন্তু মূল অনুপ্রেরণা ছিল তাঁর গভীর আস্তিক্যবাদে। জগত ও জীবন তাঁর কাছে ছিল রূপাতীত, অনন্ত দেশ-কালব্যাপী এক মহান আনন্দশক্তির প্রকাশ। আর এই আনন্দশক্তির প্রকাশই ছিল রবীন্দ্রনাথের ভাববাদের মূল ভিত্তি। আনন্দশক্তি দিয়েই ব্যক্তিভাব প্রসারিত হতে থাকে পরিপূর্ণ ভাবরূপী পরমসত্তার সঙ্গে। এক নির্বিশেষ পরমভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রতীতি তাঁর ‘শেষ-পরের’ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়:

> *“এই ঘন আবরণ উঠে গেলে*
> *অবিচ্ছেদে দেখা দিবে*
> *দেশহীন, কালহীন, আদিজ্যোতি*
> *শাশ্বত প্রকাশ পারাবার*
> *সূর্য যেথা করে সন্ধাস্নান*
> *যেথায় নক্ষত্র যত মহাকায় বুদ্ধদেবের মতো।*
> *উঠিতেছে ফুটিতেছে*
> *যেথায় নিশান্তে যাত্রী আমি*
> *চৈতন্যসাগর তীর্থপথে” ।*
>
> (রায় (সম্পাদিত), ১৯৯২ : ৩৪৫)।

ভাববাদী চেতনা তাঁর দৃষ্টিতে শুধু প্রাণের সীমানায় অবদ্ধ নয়। জন্ম-মৃত্যুহীন এক বিশ্বময় ভাবের অস্তিত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন সেই আনন্দস্বরূপ ভাবময় পরম সত্তার মধ্যে। পরমসত্তা কোন গুণবিশেষ নয়, রসের উপলব্ধির জন্যই পরমসত্তা বহু ও বিচিত্রের মধ্যে প্রকাশিত। তিনি এককত্বের মধ্যে পাননি, পেয়েছিলেন বহুর মধ্যে। এই আনন্দের কোন কারণ নেই। পরমসত্তা আনন্দস্বরূপ, তিনি আমাদের কাছে প্রকাশমান। রবীন্দ্রনাথ প্রতীচ্যের ভাববাদী দার্শনিক ব্রাডলীর মতো তাঁর 'পরমসত্তা'কে অগম্য ও অচিন্তনীয় মনে করেননি। আবার জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতো বিশুদ্ধ চিন্তার রীতিকেও বিশ্বব্যাখ্যায় সর্বোত্তম উপায়রূপে গ্রহণ করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, হৃদয়ের উন্মীলনে পরমসত্তার অভিজ্ঞতা সম্ভব। জ্ঞান থেকে নয়, দৃষ্টি আর বোধ থেকেই সে অভিজ্ঞতার স্পর্শ আমরা পেতে পারি। এ সম্পর্কে তিনি বলেন: *"আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্ভাধিত করে তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা"।* (ঠাকুর, ১৩২৪ : ২৩)। মূলত ঐক্যের সামগ্রিক রূপই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল সর্বাধিক। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের সামগ্রিক রূপের যে প্রসারিত দিকটি আমরা পাই তাঁর সমধর্মী প্রতীচ্যের দার্শনিকদের মধ্যে একান্তই অনুপস্থিত। এই ঐক্যভাব অভিব্যক্তির পথে পরিপূর্ণ পরমসত্তার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। সমকালীন দার্শনিক চিন্তায় রবীন্দ্রদর্শনের বিস্ময়কর প্রাসঙ্গিকতা "পরমসত্তা স্বরূপ" গভীরভাবে অনুধাবনের অপেক্ষা রাখে।

তথ্য নির্দেশ

Aristotle, 1951. *Elements of Metaphysics.* London, P. 394.

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), ২০০১. *রবীন্দ্রনাথ.* ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, পৃ. ৪৫।

Chatterjee, S. C., 1964. *The Problem of Philosophy.* The University of Calcutta., P. 44.

বন্দোপাধ্যায়, শ্রী. হি., ১৩৬৩. *রবীন্দ্রদর্শন.* কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৯-২০।

রায় (সম্পাদিত), স., ১৯৯২. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: দর্শনচিন্তা.* কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৫৭।

রায় (সম্পাদিত), স., ১৯৯২. *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ: দর্শনচিন্তা*, কলকাতা: গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৩৪৫।

Passmore, J., 1961. *A Hundred Years of Philosophy.* London: Penguin Books Ltd., P. 69.

Radhakrishnan, D. S., 1961. *The Philosophy of Rabindranath Tagore.* Baroda: Good Companions Publisher, P. 76.

Ibid, P. 77.

Russel, B., 1954. *History of Western Philosophy.* London: Jeorge Allen and Unwind Ltd., P. 94.

Russel, B., 1954. *History of Western Philosophy.* London: Jeorge Allen and Unwind Ltd., P. 137.

Ryle, G., 1929. *The concept of Mind.* London: Charles Scribner Son's, P. 220.

Tagore, R., 1917. *Personality.* London: Macmillan and Co. Ltd., P. 25.

Tagore, R., 1917. *Personality.* London: Macmillan and Co. Ltd., P. 97

Tagore, R., 1917. *Personality.* London: Macmillan and Co. Ltd., Pp. 98-99.

Tagore, R., 1917. *Personality.* London: Macmillan and Co. Ltd., P. 13.

Tagore, R., 1961. *The Religion of Man.* London: Unwind Books Ltd., P. 14.

Tagore, R., 1961. *The Religion of Man.* London: Unwind Books Ltd., P. 128.

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'ধর্মের সরল আদর্শ' রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড.* কলকাতা: শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৫৭।

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'ধর্মের সরল আদর্শ' রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড.* কলকাতা: শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৩।

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'আত্মপরিচয়' রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড,* শান্তিনিকেতন, পৃ. ২০৩।

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'প্রাচীন ভারতের এক' রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড.* কলকাতা: শান্তিনিকেতন, পৃ. ৩১।

ঠাকুর, র., *'প্রাচীন ভারতের এক' রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড*, পৃ. ৩১।

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড.* কলকাতা: শান্তিনিকেতন, পৃ. ৬০৩।

ঠাকুর, র., ১৩২৪. *'মুক্তি' রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড.* কলকাতা: শান্তিনিকেতন, পৃ. ২৯০।

ঠাকুর, র., *শেষলেখা' ১১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড*, পৃ. ৯০৪।

ঠাকুর, র., *'আমার জগত', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড*, পৃ. ৫৬৩।

ঠাকুর, র., *'আমার জগত', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড*, পৃ. ৫৬৪।

ঠাকুর, র., *'মানুষের ধর্ম', রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড.* শতবর্ষ সংস্করণ, পৃ. ৫৮৫।

ঠাকুর, র., *'মুক্তি' রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খন্ড*, পৃ. ২৪৬।

ঠাকুর, র., *জন্মদিনে' ১১ সংখ্যক কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খন্ড*, পৃ. ৮৪৭।

[**Abstract:** This paper will focus "the nature of absolute in Rabindranath's philosophy" Despite the fact that in determining his concept of absolute is similar to those of the famous German philosopher Hegel and his Brirish adherent Bradley, there is a vast difference. Rabindranath is undoubtedly an idealist; yet he didn't regard that the

absolute is unthinkable and indomitable something unlike Bradley. Again, he didn't accept pure thought process as the most appropriate way of experiencing the absolute unlike Hegel. According to Rabindranath's belief, neither from knowledge nor from vision and understanding the experience of absolute is possible, but it is possible through bringing together of hearts. Overall form of unity attracted Rabindranath mostly. The main objective of this paper is to find out the eastern and western philosophical thoughts in relation to the nature of the absolute in Rabindranath philosophy. This paper will analyses these Nature of Absolute in Rabindranath's philosophy.]